মধ্যযুগে বাংলার জীবনচর্যা

ইউনিট ৭

ভূমিকা

তের শতকে মুসলমানরা বাংলাদেশ জয় করে মুসলিম সমাজ নির্মাণ করে এবং মুসলিম সভ্যতা গড়ে তোলে। সেই থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মিত হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে বহির্দেশ থেকে আগত মুসলিম প্রভাব। শুধু শাসন ক্ষেত্রেই নয় সমাজজীবনেও যা স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। মুসলিম শাসন নিয়ে যেমন সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হয়নি, আবার মুসলিম শাসকগণও হিন্দু ও বৌদ্ধদের স্বাধীনতা দানে কার্পণ্য করেনি। সামন্ত সমাজের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুদের মধ্যে যারা লেখাপড়া ও আর্থিকভাবে অগ্রসর (ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয়) ছিলেন তারাই অভিজাত শ্রেণি হিসেবে সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ ও ভোগ করেছেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ ঃ মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি
পাঠ-৭.২ ঃ মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৭.১ মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় সংমিশ্রণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মধ্যযুগের অর্থনৈতিক আবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুসলিম শাসন, বাঙালি জাতিসত্ত্বা, কৃষি অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন, মুদ্রা

মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন উপাদান যুক্ত হয় ও বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলার লোকজন ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু। মুসলমানরা নিয়ে আসে একটি নতুন ধর্ম, ইসলাম – যার সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশি। প্রথম বিজয়ীরা ছিল তুর্কি। তুর্কিরা প্রায় তিনশ বছর ধরে

শাসকের মর্যাদা লাভ করে। ইলিয়াস শাহীরাও তুর্কিই ছিল, তার পরে হাবশী এবং হাবশীদের পরে সৈয়দ বংশের সুলতানরা শাসনক্ষমতা দখল করে। এরপর বাংলায় চলে আফগান ও মুঘল শাসন। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকদের সহযোগী লোকেরাও যেমন বিদ্বান, পেশাজীবী, স্থপতি, প্রকৌশলি, প্রশাসক এবং কারিগরও এদেশে আসে। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যও অনেকে দিল্লি বা বাংলাদেশে আসে। অনেক আরব ধর্ম প্রচারের জন্যও আসেন। পারস্য থেকে আগত মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল, তাঁদের ফার্সি ভাষাই মুসলমান আমলে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। সুফিদের মধ্যে অনেকেই পারস্য থেকে আসেন ।

সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আর্থিক ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষকে অধিকতর শোষিত ও অবহেলিত করে রাখা। বাংলাদেশও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শোষিত হতো, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত। তবে মধ্যযুগে বাংলাদেশে খাদ্য, পুকুরে মাছ, গোয়াল ভরা গরু থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসরাও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে অভিজাতশ্রেণিতে স্থান পেতেন।

জাতিগত পরিচয় ও বাংলার সামন্ত সমাজ

বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনপদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজশাসনের ফলে মধ্যযুগের আগেই সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি হতে থাকে। তবে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তিই সবচেয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যা অন্য উপজাতিগুলো পারেনি। মধ্যযুগের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চাকমাসহ বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতি পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এসে পার্বত্যঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যোগাযোগ তেমন ছিল না। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ ছিল এবং সম্পর্ক প্রীতিমূলক ছিল। সুফিসাধক এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রভাবে তের শতকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে । তখন থেকে নিম্নবর্ণের শোষিত মানুষের ইসলাম ধর্মগ্রহণের ফলে বাঙালি মুসলিম বলে একটি সম্প্রদায়ের সংযোজন ঘটে। মধ্য যুগে তুর্কি, আফগান, মুঘল, ইরানি, আরব, হাবশিসহ মধ্য প্রাচ্যের আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীরও আগমন ঘটে। এর আগে এখানে জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। ষোল শতকে বাংলায় পর্তুগিজ এবং আর্মেনীয়গণেরও বসতি স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে আরাকানি জাতিগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত হয়। ফলে মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্তায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আরো মিশ্রণ ঘটেছিল।

দীর্ঘ যে সব রাজশাসন ব্যবস্থা বাংলায় কার্যকর ছিল তাতে ইসলাম ধর্ম, সুফিবাদ, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম, বিদেশী শাসক, বণিক ও সাধারণ মানুষের আগমন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। মুঘল আমলে ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বেশি ঘটেছিল। কিন্তু অভিজাত সমাজের ভেতরে টিকে থাকা বর্ণ ও শ্রেণি বৈষম্যের কারণে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে শ্রেণি বিভেদ মুছে যায়নি। আভিজাত্যের ভিত্তিতে স্বয়ং মুসলিম সমাজই আশরাফ ও আতরাফ নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল হচ্ছিল না। হিন্দুদের মধ্যেও জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল। সমাজে প্রশাসন, জমি বণ্টন, বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে যারা জড়িত ছিলেন তারা অভিজাত বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। অপেক্ষাকৃত কম দামের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সমাজের নিম্নবর্ণ, আতরাফ, ক্রীতদাস, চাকরবাকর ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মতোই মুসলমান সমাজে শেখ ও সৈয়দরা কৌলীন্য দাবি করে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন। হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। কুসংস্কার ও যাদুটোনার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল প্রায় একই রকমের। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উভয়ের সামাজিক বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করত। সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যে উদারপন্থী ধারা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমন্বয় প্রচেষ্টার নিদর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এ আমলে মুসলমান লেখক হিন্দু পুরাণ, গাঁথা এবং ঐতিহ্যকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম আমলে বাংলায় এক ধরনের মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। ইবনে বতুতা, বারবোসা, আবুল ফজলসহ বিভিন্নজনের লেখায় বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থনীতির সমৃদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে।

সুলতানি যুগে বাংলা স্বাধীন থাকার কারণে কৃষি, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘল যুগে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির ব্যাপক উন্নতি হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করায় বহু অর্থাগম হতো। ১৬৮০–১৬৮৪ সময়ে কেবল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ষোল লাখ টাকার জিনিস ক্রয় করে। ওলন্দাজরাও এর চেয়ে বেশি জিনিস ক্রয় করত। সুতরাং এই দুই কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি বছর আট লাখ রূপার টাকা বাংলায় আসত। বর্তমান মূল্যে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকা এই দুটি ইউরোপীয় কোম্পানি দিত। অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যতো ছিলই।

ইবনে বতুতা

কৃষি অর্থনীতি

চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর ধান হতো। সতের শতকে বার্ণিয়ার লিখেছেন যে, অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশই সর্বাপেক্ষা শস্যময় ; কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। মুসলিম আমলে দীর্ঘ সময়ে কৃষি অর্থনীতিই প্রধান ছিল। তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কুটিরশিল্পও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের সকল রাজবংশের শাসনামলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশ চিরকালই শস্য-শ্যামলা চিরসুন্দর নয়নাভিরাম বলে দেশী-বিদেশীদের হৃদয় জুড়িয়েছে। এতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন করত বলেই মধ্যযুগে বাংলার দেড় কোটি মানুষকে তিন বেলা ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বাংলাদেশ। ধানের পাশাপাশি পাট, গম, আম, যব, লাক্ষা, তেলবীজ, রসুন, মরিচ, মসলা, রেশম, রবিশস্য, ইক্ষু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হতো। বাংলা থেকে প্রচুর চাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।

শিল্প

বাংলার শিল্পের মধ্যে বয়ন শিল্প ছিল অন্যতম। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের বস্ত্রের নাম ছিল 'মসলিন'। মসলিন ও রেশম শিল্প মুসলিম শাসক, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। বাংলায় ইক্ষুর উৎপাদন ছিল ব্যাপক। এই ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদিত হতো। মুসলমান আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। চিনির মতো লবণ ছিল আরেকটি প্রধান শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদিত হতো। মধ্যযুগের বিভিন্ন শাসনামলে কৃষিভিত্তিক কিছু কুটির শিল্প যেমন বস্ত্র ও রেশম শিল্প বিশ্বজোড়া বাংলার খ্যাতি নিয়ে এসেছিল। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় লোহাজাত জিনিসপত্র তৈরি হতো। বাংলায় কাঠের আসবাবপত্র তখন বিশেষ গুরুত্ব পায়। নদ-নদীর দেশে নৌকা ছাড়া চলাফেরা করা যেত না। ফলে এখানে নৌকা ও জাহাজ শিল্প প্রসার লাভ করে। দেশবিদেশে বাণিজ্যের জন্য বড় বড় নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হতো। বাংলার 'মসলিন' কাপড়ের চাহিদা দেশের বাইরে তুরস্ক, খোরাসান, পারস্যসহ বিভিন্ন দেশে ছিল। তখনকার অর্থনীতিতে এর প্রভাবও ব্যাপক ছিল। ইউরোপের বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের জায়গা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব ছিল। এর নানা রকমের কাঁচামাল, মসলিন, তাঁতের কাপড় ইত্যাদির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল।

বাণিজ্য, নগরায়ণ এবং মুদ্রা

মধ্যযুগের বাঙালি সওদাগররা 'সপ্তডিঙ্গা-মধুকর' ভাসিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলে অনেক গল্প চালু আছে। তখন বাঙালিরা সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীনে পাড়ি দিত। বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের নাম তখন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, হুগলি, ঢাকাসহ বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রবর্তন একটি বড় বিষয়। কারণ এর ফলে বিনিময় প্রথার পরিবর্তন ঘটে। শেরশাহ রৌপ্যমুদ্রা চালু করেন। আকবর স্বর্ণ নির্মিত 'মোহর' ও রূপা নির্মিত 'জালালা' এক সঙ্গে চালু করেন। খুচরা বাজারে 'কড়ি' চলত। সরকার এগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করত। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়। অর্থনীতির এসব সংস্কার বাংলায় নগর সভ্যতা চাঙ্গা করে, বেনিয়া ইংরেজদের আকৃষ্ট করে, মজুরিভিত্তিক কর্মচারী, চাকরিজীবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করতেন।

মুদ্রাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই নিজের নামে মুদ্রা চালু করতেন। এই সব মুদ্রায় তারিখ থাকত। সতের শতকের পর থেকে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল টঙ্ক—এই টঙ্ক থেকেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। সাধারণ কেনাবেচায় কড়ি ব্যবহৃত হত।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার জীবনযাত্রার মান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি 'বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে বেহেস্ত' বিরাজ করছে বলে তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন। বস্তুত মুঘলদের আগের মামলুক বংশ, ইলিয়াসশাহী বংশ, হুসেনশাহী বংশ, শূর বংশের রাজত্বকালে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধির ধারায় চলেছিল। মুঘলরা ক্ষমতা দখলের পর রাজস্বনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর সরকারি নীতি-নিয়ম আরোপ করায় অর্থনীতি কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিতে পরিচালিত হতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত সুবা-বাংলার সঙ্গে ভারতসহ বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মুঘল যুগে আধুনিক বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই প্রবর্তন ঘটেছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ 'মসলিন' কাপড়ের একটি চিত্র অংকন করবেন এবং কয়েকটি গ্রুপ করে মুসলিন বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিবেন।

সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত বাংলায় তের শতক থেকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। সামন্ত সমাজের বৈষম্যের কারণে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। তবে মুসলিম সমাজ ও আশরাফ ও আতরাফ নামে ভাগ হয়েছে। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির ব্যাপক সমৃদ্ধি হয়। কৃষিতে ধান শিল্পে মসলিন এবং বাণিজ্যে নানা অঞ্চল যেমন ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীনের সাথে বাণিজ্য হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে সরকারী ভাষা ছিল– (জ্ঞান)
ক) আরবি খ) উর্দু
গ) ফার্সি ঘ) ইংরেজি

২। কৃষিই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কেননা–
i) নদনদীর সমাহার ii) পলি গঠিত সমভূমি iii) রপ্তানিজাত পণ্যের উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

৩। হাফিজুর রহমান স্যার মধ্যযুগের অর্থনীতির উপর বক্তব্য রাখার সময় বলেন যে বর্তমান সময়ের তৈরি পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগে বস্ত্রশিল্পে বাংলার অগ্রগতি, দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যর অধিকাংশ ছিল রপ্তানি নির্ভর।
ক. সম্রাট আকবর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার নাম কী?
খ. সুলতানি যুগে বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে মধ্যযুগের অর্থনীতির যে চিত্র দেখা যায় তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. বর্তমানে পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগের বয়ন শিল্প বাংলাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়, আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-৭.২ মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিম আমলে ধর্মীয় বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলায় ইসলাম ধর্ম বিস্তারে সুফিবাদের প্রভাব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধর্ম, সুফিবাদ, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা, স্থাপত্য, শিল্পকলা

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আর এ কারণে মুসলিম যুগের সাহিত্যে সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচার, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, মানব কল্যাণে কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ নিয়ে সুফিসাধকগণ বাংলাদেশে আসেন। বাংলার অনেক জায়গায় তাদের প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' গুলো আধ্যাত্মিক, মানব কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রসারে বড় অবদান রাখে। ক্রমে তারা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমন্বিত করে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মরমী চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করায় সুফিবাদের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আকৃষ্ট হয়। ফলে বাংলার সুফিবাদ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিকতর উদার ও মানবকেন্দ্রিক চরিত্র অর্জন করে। সুফিবাদের কারণে বাংলার সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত লোপ পায়। মরমী বাউলরা হিন্দু-মুসলিম মিলনের আদর্শই প্রচার করে।

বহিরাগত মুসলিম শাসকরা বাংলার সমাজজীবনের সাথে তাদের শাসন আত্মীকরণ করার ফলে ধর্মীয়ভাবে ইসলাম বৃহত্তর বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী শাসনের সূচনাকাল থেকেই বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সমাজ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেছিল। মুঘল আমলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠে। ঐ সময়ে লেখা 'মনসামঙ্গল' ধর্ম সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল উদাহরণ। ধর্মীয় পরিচয় বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ বা সংকট সৃষ্টি করেনি।

ইসলাম ধর্মের বিস্তারে সুফিবাদের প্রভাব

চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে সুফি প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজির নাম *শেখশুভোদয়ার* (শেখের শুভ উদয়) সঙ্গে জড়িত। এ গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। *শেখশুভোদয়া* সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনৌতিতে বাস করতেন। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজেবের সনদসূত্রেও মিলে। ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎসাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগিজরা নৌপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহজালাল নামে বিখ্যাত এই সাধুপুরুষ উত্তর পূর্ব বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। তার উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে ঐ অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। আদর্শ জীবন ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সেবার জন্য তিনি অমুসলিমদেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। আজও তিনি সাধারণ লোকপ্রবাদে অমর এবং শত শত লোক সংগীতে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। শেখ আঁখি সিরাজুদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। তিনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের

বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হতো। আলাউল হকের পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। তাঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানি জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শরকির সমসাময়িক ছিলেন।

শাহজালাল (রা:)-এর মাজার, সিলেট

সুফিদের দ্বারা দীক্ষিত অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানের কারণে অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, তারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরোপুরি বাঙালিই রয়ে গেল। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ হয়। পীর, দরবেশ ছাড়াও বাংলার মুসলমানদের কিছুসংখ্যক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরাণিক নায়কের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন খাজা খিজির।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। এই সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা পায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুলতানদের দরবারে প্রবেশ করে। প্রথমে সুলতানরা ও তাঁদের আমাত্যেরা হিন্দু কবিদের উৎসাহ দেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্থাৎ মুসলিম সুলতানরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশে সহায়তা দান করেন। পরে মুসলিম কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহাম্মদ সগীর একমাত্র মুসলিম কবি যিনি সুলতানি আমলে কাব্য রচনা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের আগে বাংলা ভাষার লিপি রচনার গতি বেশ ধীর ছিল। পাল ও সেন যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা হল চর্যাপদ। চর্যাপদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয়, বলা চলে এটি বাংলা-পূর্ববর্তী ভাষা। কিন্তু তারপরও চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে চর্যাগীতি বলেন। কেননা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে মুখে এগুলো গান হিসেবে প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা নতুন গতি লাভ করে সুলতানি যুগে। ফারসি ও আরবির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে। সুলতানি যুগে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার প্রসার ঘটে। ইলিয়াসশাহী আমলে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় ভাবপ্রবণ ও মানবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেন। চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খার সহযোগিতায় কবি পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন। আরো অনেক গ্রন্থই তখন রচিত হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক কাব্যের সাহিত্য রচনা হয়। ষোড়শ শতকে সারিবদ্ধ খাঁ নামক একজন মুসলমান 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী যুগে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে। বাংলার শাসকগণ এ সময়ে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সুফি-দরবেশ এবং আলেম-উলামাগণ মুসলমানদের মধ্যে আর পণ্ডিতগণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম যুগে বাংলায় অসংখ্য মাদরাসা গড়ে ওঠে। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রকে বলা হতো 'মকতব'। সাধারণত গ্রামের মসজিদে এ সব মকতব বসত। প্রাথমিক পর্বে আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। সাধারণত গ্রামের কোনো শিক্ষিত যুবক এসব পাঠশালা চালাত।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে টোল ও মাদরাসা। সাধারণত প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ড় প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া সবকিছু বিনামূল্যে পরিচালিত হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র টোলে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পড়ানো হতো। নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

মধ্যযুগের বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুফিসাধকগণ 'খানকাহ'গুলোকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশে মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে মাদরাসা গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব বেশি ছিল। সম্রাট আকবরের শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। মকতবেও গদ্য-পদ্য পড়ালেখা ছাড়াও কবিতা মুখস্থ করা ও অংক আবশ্যক করা হয়। ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ যথেষ্ট এগিয়ে আসেন। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি পড়ানো হতো। তবে মধ্যযুগে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা তেমন গড়ে উঠেনি। নারীদের শিক্ষা ছিল সীমিত আকারের এবং তা প্রধানত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ছিল।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মধ্যযুগে যে সব দেশ থেকে শাসকশ্রেণি বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন বহন করে এনেছিলেন। এগুলো তাদের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যের উপকরণ বাংলায় বেশি লক্ষ করা গেছে। মসজিদ নির্মাণে বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুঘলরা যতখানি যত্নবান ছিলেন সুলতানি যুগে এই শিল্পের তেমন কদর ছিল না। ফলে বাংলায় চিত্র শিল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ততটা বিকশিত হতে পারেনি। তবে মুঘল আমলে ঢাকাসহ কিছু কিছু জায়গায় মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন স্থাপিত হয়েছিল। এই ধারা সুবাদারদের আমলেও অব্যাহত ছিল। ঢাকায় নবাবী আমলে জিনজিরা প্রাসাদসহ নির্মিত ইমারতসমূহ এখন দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ সুফি সাধকদের বিশেষ করে হযরত শাহজালালের উপর রচিত বিভিন্ন লোকগান সংগ্রহ করবেন এবং কোনো একটি গান শিখে নিজেদের মধ্যে পরিবেশন করবেন।

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে সুফিদের অবদান ছিল অনেক। মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রভাব ছিল। এসময় এ দুই সম্প্রদায়ের নানান গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়। মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। শিক্ষা কাজে মুসলমানদের জন্য মাদরাসা ও মকতব হিন্দুদের জন্য টোল ও পাঠশালা ব্যবহার হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুফিদের প্রতিষ্ঠিত খানকাগুলো ছিল–

i) বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রসার স্থল ii) আধ্যাত্মিক কর্ম সাধনার স্থান iii) সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন স্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ii খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। একমাত্র কোন মুসলিম কবি সুলতানি আমলে বাংলায় কাব্য রচনা করেন?

ক) শাহ মুহাম্মদ সগীর খ) শেখ আলাউল হক গ) সারিবদ্ধ খা ঘ) সৈয়দ আশরাফ সিমনানী

৩। সুলতানি যুগে কোন শিল্পের কদর ছিল না?

ক) স্থাপত্য শিল্প খ) চিত্র শিল্প গ) বয়ন শিল্প ঘ) কুটির শিল্প

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ